প্রাথমিকে ঝরে পড়া কমলেও থামছে না

মানসুরা হোসাইন ●

শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার দিন দিন কমলেও তা এখনো উদ্বেগজনক। পাশাপাশি বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির হার শত ভাগের কাছাকাছি (৯৯.৪৭ শতাংশ) হলেও সুবিধাবঞ্চিত অনেক শিশু এখনো বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নানা ধরনের আইন, বিধি ও উদ্যোগ সঠিকভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় এ ক্ষেত্রে কিছুটা পিছিয়ে আছে বাংলাদেশ। তবে এগুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা গেলে আরও সফলতা আসতে পারে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধূরী *প্রথম আলোকে* বলেন, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নানা উদ্যোগ থাকার পরও এখনো প্রায় ২০ লাখ শিশু বিদ্যালয়ে যাওয়ারই সুযোগ পাচ্ছে না। আর ভর্তি হওয়া শিশুদের এক-তৃতীয়াংশই প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে। তিনি বলেন, প্রথম শ্রেণী থেকে শিশুরা যত ওপরের দিকে উঠতে থাকে, ততই ঝরে পড়ার হার বাড়তে থাকে। যার প্রভাবে পরবর্তী সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে গিয়ে মাত্র ২৭ শতাংশ শিক্ষার্থী টিকে থাকছে।

শিক্ষা ও প্রাথমিক মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, ২০০৫ সালে মাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়ার হার ছিল ৮০ শতাংশের বেশি। কিন্তু বাংলাদেশ শিক্ষা, তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সর্বশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, এ হার কমে হয়েছে ৫৩ দশমিক ২৮ শতাংশ। আর প্রাথমিকে ঝরে পড়ার হার ৩৯ দশমিক ৮০ শতাংশ। প্রতিবেদন বলছে, ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ২০০৮ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০০৭ সালে দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে ৪৪ লাখ ৮৪ হাজার ৬৪ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এর মধ্যে মেয়েশিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ৪৯ দশমিক ৭৯ শতাংশ। ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয় ৪২ লাখ, ৮৩ হাজার ৯৪ জন। মেয়েশিক্ষার্থীর হার দাঁড়ায় ৪৯ দশমিক ২৪ শতাংশে। এ পরিসংখ্যান বলছে, এক বছরে এক লাখের বেশি মেয়েশিক্ষার্থী ঝরে পড়ে।

অন্যদিকে ২০০৮ সালে যেসব শিক্ষার্থী প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়, সেই শিক্ষার্থীরাই ২০১২ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের গত বছরের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার ফলাফলের সারসংক্ষেপ অনুযায়ী, পঞ্চম শ্রেণীর মোট ২৬ লাখ ৪১ হাজার ৯০৩ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষার জন্য তালিকাভুক্ত হয়। অথচ ২০০৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিল ৪২ লাখ শিক্ষার্থী। অর্থাৎ পাঁচ বছরের ব্যবধানে শিক্ষার্থী কমেছে প্রায় ১৬ লাখ।

জাতীয় শিক্ষানীতিতে ঝরে পড়া কমানোর জন্য নানা ধরনের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। এ জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়বিহীন গ্রামে কমপক্ষে একটি বিদ্যালয় তৈরি, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী শিশুসহ পিছিয়ে পড়া শিশু ও পিছিয়ে পড়া এলাকাগুলোর প্রতি নজর বাড়িয়ে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। আদিবাসী শিশুদের নিজ নিজ ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ, উপবৃত্তির সংখ্যা বাড়ানো, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতেও বলা হয়েছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরের খাবারের ব্যবস্থাসহ আরও বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিতে বলা হয়। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনের খসড়াতেও প্রাথমিক শিক্ষা থেকে শিশুরা যাতে ঝরে না পড়ে, সে জন্য প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা পিছিয়ে

শ্রেণীকক্ষের এই শিশুদের সবাই আর্থসামাজিক কারণে শিক্ষা শেষ করতে পারে না ● ছবি : সংগৃহীত

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান অর্থনীতিবিদ কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ *প্রথম আলোকে* বলেন, শুধু আইন বা নীতি করে বসে থাকলেই হবে না, তা বাস্তবায়নের দিকে নজর দিতে হবে। পাশাপাশি সমাজের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি পাল্টানোর জন্য দারিদ্র্য নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ অন্য বিষয়গুলো বাস্তবায়নে সমন্বিতভাবে পদক্ষেপ নিতে হবে। তবে তিনি বলেন, বিদ্যালয় গমনোপযোগী শতভাগ শিশুকে বিদ্যালয়ে আনার যে লক্ষ্যমাত্রা, তা অর্জনের পথেই আছে বাংলাদেশ।

সুবিধাবঞ্চিত শিশুরা পিছিয়েই আছে : সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, প্রতিবন্ধী, আদিবাসী, দলিত-হরিজন সম্প্রদায়, শ্রমজীবী শিশু, বস্তি, হাওর বা পাহাড়ি এলাকার অনেক শিশু এখনো বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। স্বল্প শিক্ষিত ও নিরক্ষর নিম্ন আয়ের অভিভাবকদের অনেকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারেন না বলে রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকেও অনেক শিশু ঝরে পড়ছে।

সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবিলিটি ইন ডেভেলপমেন্টের (সিডিডি) পরিচালক এ এইচ এম নোমান খান বলেন, বর্তমানে খুব বেশি হলে বিভিন্ন স্তরে সুবিধাবঞ্চিত ১৫ শতাংশ শিশুকে শিক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

অথচ সংবিধানে সব নাগরিকের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করাকে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের প্রাথমিক শিক্ষা (বাধ্যতামূলক করা) আইন অনুযায়ী, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি এলাকায় প্রতিটি শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং নিয়মিত হাজির হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করার কথা। যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন না করলে ওই কমিটির প্রতিটি সদস্য অনধিক ২০০ টাকা এবং অভিভাবকেরা পরপর তিনবার নির্দেশ পালন, না করার অপরাধে অনধিক ২০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন বলে আইনটিতে বলা আছে। কিন্তু এই আইনের সঠিক বাস্তবায়ন নেই।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজধানীর একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বলেন, অনেক সময় অভিভাবকদের অনুরোধ করে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে আনতে হয়। এরপর অনেকে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়, নয়তো এনজিও বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হয়। এ অবস্থায় অভিভাবকদের জরিমানা করতে গেলে অবস্থা আরও খারাপ হবে। এ ছাড়া বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কমিটিতে এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা সদস্য হলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এ কাজে তাঁরা সময় দিতে পারেন না।